জিনের গরু গাছে

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি একটি জার্মান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বিজ্ঞানের এক ছোট খবর -- ম্যামথের গায়ের রং কালো ছিল না, ছিল লালচে বা নীলাভ লাল । হ্যাঁ, সেই ম্যামথ, অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক হাতি -- ঘন লোমে ঢাকা বিশাল শরীর, মস্ত পাকানো দাঁত । আলাস্কা আর সাইবেরিয়ার বরফের নীচে খুঁজে পাওয়া গেছে বহু ম্যামথের হিমায়িত মরদেহ । লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার সেই জন্তুটির গায়ের রং কেমন ছিল - সে দুরূহ প্রশ্নেরও উত্তর আজ এনে দিচ্ছে বিজ্ঞান / জিন-বিজ্ঞান / জেনেটিক্স্ বা বংশানুবিজ্ঞান । জিনতত্ত্ব থেকে জিন-প্রযুক্তির অভিনব অগ্রগতিতে বারবার চমকে গেছে বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব ।

জীবদেহের ক্ষুদ্রতম কোষ বা cell-এর মধ্যে থাকে নিউক্লিয়াস । নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজম। ক্রোমোজমের ভেতর ডি. এন. এ অণু । সেই অণুর মধ্যে জিন-কণা । মানুষ এবং জীবপ্রজাতির যাবতীয় জীবন-রহস্যের গোপন ঠিকানা লুকিয়ে আছে এই জিন-কুঠুরিতে । বিজ্ঞান সেখানে পৌঁছে গেছে আর বিস্ময়ের দুয়ার উন্মোচিত করেছে একের পর এক । গত পঞ্চাশ/ষাট বছরে কৃষিক্ষেত্রে ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আশ্চর্য সব উদ্ভাবনের পর জিন-প্রযুক্তির রোমাঞ্চকর উত্তরণ ঘটল বিংশ শতাব্দীর শেষে, ১৯৯৬ সালে । স্কটল্যান্ডের রসলিন ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ইয়ান উইলমুট ও তাঁর সহকর্মীরা দিব্যি এক ভেড়ার ছানা বানিয়ে ফেললেন একটি স্ত্রী-ভেড়ার একটি দেহকোষ 'ক্লোন' ক'রে -- কোনোরকম যৌন প্রজনন ছাড়াই । মানবসৃষ্ট সেই মেষশাবক 'ডলি' কেবল দুনিয়াকেই কাঁপালো না, খুলে দিল আরো সব অবিশ্বাস্য সম্ভাবনার দুয়ার । 'ক্লোন' করা নকল ভেড়ার পরে নকল বাছুর, নকল ঘোড়া, নকল বানর থেকে নকল মানুষ সৃষ্টির প্রকল্পও জিন-বিজ্ঞানীরা হাতের মুঠোয় তুলে নিলেন । এবং তখনই, অনিবার্যভাবে, বৃহত্তর জনসমাজের চেতনায় আলোড়ন উঠল । উঠে এলো সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সব প্রশ্ন : বিজ্ঞান মানুষকে সৃষ্টি করবে , কিন্তু তার মন ? সংস্কৃতি ? অনুভব ? বিশ্বাস ? -- এদের হদিশ কে দেবে ? . . . জিন-প্রযুক্তির আশ্চর্য সব কর্মকান্ডে জনগণের রোমাঞ্চ, উত্তেজনা, কল্পনা লাগাম ছেড়ে দিচ্ছে । ওদিকে জিন-বিজ্ঞানীদের একটা বড় অংশ সম্ভাবনার ফানুসকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করছেন, আর বাজারলোভী মিডিয়া সেসব সুস্বাদু খাদ্য লুফেও নিচ্ছে টপাটপ ।

এমনই এক বিতর্কিত গিমিক নিয়ে বাজারে নেমেছেন আমেরিকার জিন-বিজ্ঞানী ডিন হ্যামার । মাত্র দু'বছর আগে ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর চমক জাগানো গ্রন্থ 'দি গড জিন'। মলাটের বড় বড় হরফের গড বা ঈশ্বর সহজেই চোখ টানে, মনও টানে । লেখক মানুষের দেহকোষে v MAT 2 জিনটিকে চিহ্নিত করেছেন আধ্যাত্মিক বোধের উৎস হিসেবে । মূল বক্তব্য : এই বিশেষ জিনটি ইঙ্গিত দেয় যে আধ্যাত্মিকতার এক জন্মগত প্রবণতা রয়েছে মানবজাতির মধ্যে, যে-কারণে ভগবানের কাছেই শেষ অব্দি পৌঁছতে চায় সবাই ।

ভয়ঙ্কর বিতর্কিত এক সিদ্ধান্ত । ব্যক্তিমানুষের বিচিত্র বহুমুখী ধর্মভাব বা ঈশ্বরভাবনাকে কেমন সরলীকরণে একটি জিনের মধ্যে আবদ্ধ করে দিয়েছেন ডিন হ্যামার । সাধারণ পাঠক পুলকিত হলেও আপত্তি উঠেছে প্রবল । ভিন্ন মত বহু বিজ্ঞানীর । বর্তমানে v MAT 2 জিনটিকে নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে ; এসব কাজের কোনোটিই ধর্ম বা ঈশ্বরতত্ত্বের কথা বলে না । উপরন্তু, হ্যামারের গড-জিন ইঁদুর বাদুর ব্যাঙ ব্যাঙাচি সবার মধ্যেই আছে, এদেরকে জন্মগতভাবে ঈশ্বরভক্ত ভাবার কোনো কারণ নিশ্চই নেই ! . . .

যাই হোক, ডিন হ্যামারের ঈশ্বর-জিন যে বড় ধাক্কা খেয়েছে, সেটাই স্বস্তির ব্যাপার ।

কৃতজ্ঞতা ঃ ড. তুষার চক্রবর্তী, Indian Institute of Chemical Biology, Jadavpur.